

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে মহামারীতে মহামনীষীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আবেদা আক্তার

রোলঃ 227022038

১৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে মহামারীতে মহামনীষীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আবেদা আক্তার

রোলঃ 227022038

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “যুগে যুগে মহামারীতে মহামনীষীদের ভূমিকা” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আবেদা আজার, আইডিঃ 227022038 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

নামঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ডিপার্টমেন্টঃ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ যুগে যুগে মহামারীতে মহামনীষীদের ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারায়াত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Abeda

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আবেদা আজার

আইডিঃ 227022038

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
পৃথিবীর বুকে প্রথম মহামারী.....	5
রাসূলের যুগে মহামারী.....	6
ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে মহামারী.....	7
শিক্ষা.....	14
উপসংহার.....	15
তথ্যসূত্র.....	16

ভূমিকা

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির উপর শাস্তি কিংবা পরীক্ষাস্বরূপ নানারূপ মহামারী প্রেরণ করেন। আর এই মহামারী কখনও সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও নেমে আসতে পারে।[1] এতে মুমিনদের জন্য যেমন শিক্ষা রয়েছে, তেমনি আত্মসংশোধনেরও সুযোগ রয়েছে।[2] তাছাড়া এটি মুমিনদের জন্য রহমতও বটে। কারণ এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মুমিন শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।[3] ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগেও বহু মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, যার অধিকাংশ ছিল সিরিয়া ও ইরাক জুড়ে। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইয়াম এটিকে তাদের জন্য অভিশাপ মনে করতেন না। বরং তারা মনে করতেন, এটি রাসূল (ছাঃ)- এর দো‘আ, যা কাফেরদের আঘাতে মৃত্যু থেকে রক্ষার উপায়।[4] নিম্নে ইতিহাসের পাতা থেকে এসকল মহামারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হ’ল।

পৃথিবীর বুকে প্রথম মহামারী

পৃথিবীতে প্রথম মহামারী এসেছিল ইহুদীদের উপর, যখন তারা যুলুম করছিল।[5] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ত্বা‘উন বা মহামারী হ’ল এক রকমের আযাব। এই ত্বা‘উন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল। তাই তোমরা কোন জায়গায় ত্বা‘উন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাক সেখানে মহামারী শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না। [6]ত্বীবী বলেন, ‘তারা হচ্ছে ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ করেছিলেন দরজার ভিতরে প্রবেশের সময় সিজদাবনত হ’তে। কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ ‘আমরা তাদের উপর আসমান হ’তে আযাব পাঠিয়ে দিলাম’ (আ‘রাফ ৭/১৬২)। ইবনু মালিক বলেন, ‘তাদের ওপর মহামারীকে আযাব হিসাবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চব্বিশ হাজার শীর্ষস্থানীয় ইহুদী মারা যায়।[7]

রাসূলের যুগে মহামারী

রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে মক্কা ও মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত পূর্বকালে মদীনা ছিল মহামারী প্রবণ এলাকা। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বরকতে তা উঠে যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) মদীনায় শুভাগমন করলে আবুবকর ও বেলাল (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর আবুবকর (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেন যে, كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ‘প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের মাঝে দিনাতিপাত করছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা অপেক্ষা সন্নিগটে’। আর বেলাল (রাঃ) জ্বর থেকে সেরে উঠলে উচ্চৈঃস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন, ‘হায়, আমি যদি কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম আর আমার চারদিকে থাকত ইযখির এবং জালীল ঘাস। মাজান্না ঝর্ণার পানি পানের সুযোগ কখনো হবে কি? আমার জন্য শামা এবং ত্বফীল পাহাড় প্রকাশিত হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনু রাবী‘আ, উতবা ইবনু রাবী‘আ এবং উমাইয়াহ ইবনু খালাফের প্রতি লা‘নত বর্ষণ কর। যেমনভাবে তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি হ’তে বের করে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। এরপর রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করলেন, اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مُدِنَا، وَصَحْحِهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَيْنَا الْجُحْفَةَ ‘হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ছা‘ ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। এখানকার জ্বরের প্রকোপকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও’। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক মহামারী প্রবণ এলাকা’।[8]

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মক্কা-মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব না ঘটলেও ইরানে ৬ষ্ঠ হিজরী তথা ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির বলেন, لم يكن طاعون أشد من ثلاثة طواعين طواعين أزدرج وطواعين عمواس وطاعون الجارف, ‘তিনটি মহামারীর চেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক মহামারী আর ছিল না। সেগুলো হ’ল আয্দাজার্দ মহামারী, আমওয়াস মহামারী ও জারেফ মহামারী’।[9] ইরানের সেই মহামারীতে কত সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছিল তা জানা যায় না। এটি শীরাওয়াইহ্ মহামারী নামেও পরিচিত যার প্রাদুর্ভাব মাদায়েন শহরে ঘটেছিল।[10] তবে ঐতিহাসিক আছমাইঈ ও আবু আইউব সাখতিয়ানী ১৬ হিজরী সনে ত্বাউনে শেরওয়াইহ বিন কিসরায়

প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন (আহমাদ আল-আদাবী, আত-ত্বাউন ফী আছরিল উমাভী)।

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে মহামারী

(১) আমওয়াস মহামারী : ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১৮ সনে শামে (বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তীন ও লেবানন) এই মহামারী সংক্রমিত হয়। ওমর (রাঃ) তখন ইসলামী বিশ্বের খলীফা। তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে জানতে পারেন যে, সেখানে মহামারী প্লেগ দেখা দিয়েছে। সেটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর রাষ্ট্রীয় সফর। মদীনা থেকে শামে অবস্থিত হেজাযের পাশে ‘সারগ’ গ্রামে ওমর (রাঃ) পৌঁছলে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ও অন্যান্য সেনাপতিগণের সঙ্গে দেখা হয়। তারা ওমর (রাঃ)-কে অবহিত করেন যে, শামে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ওমর (রাঃ) তখন ছাহাবীদের কাছে এ মর্মে পরামর্শ চান যে, তিনি শামে সফর করবেন, নাকি মদীনায় ফিরে যাবেন? এ নিয়ে ৩টি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়- প্রথমটি ছিল মুহাজির ছাহাবীদের পরামর্শ। এতে কিছু ছাহাবী মতামত দিলেন যে, আপনি যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, সে উদ্দেশ্যে সফর অব্যাহত রাখেন। অর্থাৎ শামে যাওয়ার পক্ষে মত দেন। আবার কিছু ছাহাবী বললেন, খলীফার সিরিয়া যাওয়া উচিত হবে না।

দ্বিতীয় ছিল আনছার ছাহাবীগণের পরামর্শ সভা। ওমর (রাঃ) আনছার ছাহাবীদের কাছ থেকেও মুহাজিরদের মত বিপরীতমুখী দু’টি মতামত পেয়ে তাদেরকেও চলে যেতে বললেন।

সর্বশেষ ছিল মক্কা বিজয়ের পরে হিজরতকারী প্রবীণ কুরাইশদের একটি দল। তাদের নিকটে খলীফা ওমর (রাঃ) পরামর্শ চাইলে তারা এক বাক্যে বলে দিলেন, ‘শাম সফর স্থগিত করে আপনার মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আপনি আপনার সঙ্গীদের মহামারী প্লেগের দিকে ঠেলে দিবেন না। ওমর (রাঃ) প্রবীণ কুরাইশদের মতামত গ্রহণ করে শাম সফর স্থগিত করে মদীনায় ফিরে গেলেন। খলীফার মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেখে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর থেকে পলায়ন করে ফিরে যাচ্ছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর দেওয়া এক তাক্বদীর থেকে আরেক তাক্বদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি।’ ওমর (রাঃ) সেনাপতি আবু ওবায়দাহকে এ কথা বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ পেশ করলেন। তিনি বলেন, ‘তুমি বলত, তোমার

কিছু উটকে তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে গেলে যেখানে দু'টি মাঠ আছে। মাঠ দু'টির মধ্যে একটি মাঠ সবুজ-শ্যামলে (তৃণলতায়) ভরপুর। আর অন্য মাঠটি একেবারে শুষ্ক ও ধূসর। এ ক্ষেত্রে তুমি কোন মাঠে উট চরাবে? এখানে উট চরানোর বিষয়টি কি এমন নয় যে, যতি তুমি সবুজ-শ্যামল মাঠে উট চরাও। তবে তা আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, সেটিও আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ।

এ সময় আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، ‘তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারী প্লেগের বিস্তারের কথা শুনেবে, তখন সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে অবস্থান কর, তাহ’লে সেখান থেকে বের হবে না’। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অতঃপর সবাই ফিরে গেলেন।[11]

উল্লেখ্য, ফিলিস্তীনের আল-কুদস ও রামাল্লার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল হ’ল আমওয়াস বা ইমওয়াস। সেখানে প্রথমে প্লেগ রোগ প্রকাশ পায়। অতঃপর তা পুরো শামে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাস এটি ‘ত্বাউন আমওয়াস (طاعون عمواس) নামে পরিচিত।

মোল্লা আলী ক্বারী উল্লেখ করেন, এ সময় তিন দিনে সত্তর হাজার মানুষ মারা যায় (মিরক্বাত ৮/৩৪১১)। এই মহামারীতে প্রসিদ্ধ ষোলজন ছাহাবীসহ ২৫-৩০ হাজার মুসলিম সৈন্য মৃত্যুবরণ করেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ, মু‘আয বিন জাবাল, তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তান, রাসূলের মুআযিয়ন বেলাল বিন রাবাহ, চাচাত ভাই ফযল বিন আববাস, ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান, সেনাপতি শুরাহ্বীল বিন হাসানাহ, হারেছ বিন হাশেম, সুহায়েল বিন আমর ও তার ছেলে আবু জান্দাল বিন সুহায়েল, গায়লান বিন সালামা, আব্দুর রহমান বিন আওয়াম, ‘আমের বিন মালেক, ‘আমর বিন ইবনু উম্মে মাকতূমসহ অনেকে। সেনাপতি আবু ওবায়দাহ মারা গেলে সেনাপতির দায়িত্ব পান মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)। তিনিও মারা গেলে দায়িত্ব নেন ‘আমর ইবনুল আছ (রাঃ)। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এরই মধ্যে ত্রিশ হাজার সৈন্য মারা যায়।[12] এই মহামারীতে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের ৪০ জন সন্তান মারা যায়। তখন তারা সবাই সিরিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন।[13]

এই মহামারীর পর মুসলিম বিশ্বে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। ওমর (রাঃ) জনগণের কাছে খাবার পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং তিনি সকল প্রকারের উন্নতমানের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। আবু ওছমান আন-নাহদী (রহঃ) বলেন, আমরা আজারবাইজানে ছিলাম। এ সময় ওমর (রাঃ) আমাদের (দলনেতার) কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবাহ ইবনু ফারকাদ! এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেকোনো নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ কর, তেমনিভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও পেটপুরে আহার করাও। আর সাবধান, মুশরিকদের ভোগ-বিলাস, বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন’।[14]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) দুর্ভিক্ষের বছর পল্লী অঞ্চলের বেদুঈনদের নিকটে উট, খাদ্যশস্য ও তৈল প্রভৃতি সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খন্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি। তাঁর এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। ওমর (রাঃ) দো‘আ করেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌঁছে দিন’। তাঁর ও মুসলমানদের দো‘আ আল্লাহ কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হ’লে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি সচ্ছল মুসলমান পরিবারের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার দ্বারা দু’জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে।[15]

২) ২৪ হিজরীর মহামারী : এই মহামারী মিসরে দেখা দেয়। এই মহামারীতে কবি আবু যুওয়াইব আল-হুযালীর পাঁচজন সন্তান মারা যায়। এই মহামারীর উৎস সম্পর্কে ইবনু বাত্তা আকবরী বলেন, এই মহামারী প্রথম ‘দাব’ নামক স্থানে দেখা যায়। তখন শামের শাসক ছিলেন মু‘আবিয়া (রাঃ)। তিনি ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবুদারদা (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন, হে মু‘আবিয়া! তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন কিভাবে যাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেছে? এরপরে মহামারী হিমছ ও দামেশকে ছড়িয়ে পড়ে। মু‘আবিয়া (রাঃ) অন্যত্র চলে যান। এরই মধ্যে এই মহামারী মিসরে ছড়িয়ে পড়ে।[16]

(৩) কুফার মহামারী : আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) দু’বার কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে কুফায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই মহামারীর

ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এটি হিজরী ৪৪ সনের পূর্বে ঘটেছিল। কারণ তিনি ৪৪ হিজরী সনে মারা যান।[17] ঐতিহাসিকগণ এই মহামারীর কথা উল্লেখ করলেও সাল উল্লেখ করেননি। ছাহাবী তারিক বিন শিহাব বাজালী (রাঃ) বলেন, اُنْتَبِأَ أَبُو مُوسَى وَهُوَ فِي دَارِهِ بِالْكُوفَةِ لِنَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ: لَا تَحْفُوا فَقَدْ أُصِيبَ فِي الدَّارِ إِنْسَانٌ بِهَذَا السَّقَمِ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْتَزِعُوا عَنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَتَخْرُجُوا فِي فَيْسَحٍ بِلَادِكُمْ وَتَرْهَبُهَا، حَتَّى يَرْتَفِعَ هَذَا الْبَلَاءُ ‘মহামারীর সময়ে আলোচনা করার জন্য কয়েকজন লোকসহ আমরা আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন তার কূফার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। সেসময় তিনি কূফার গভর্নর। আমরা সঙ্গীদের নিয়ে যখন বসতে গেলাম, তখন আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলে উঠলেন, আপনারা নগ্নপায়ে হাঁটবেন না। কারণ এ ঘরে একজন লোক মহামারীতে আক্রান্ত। আর মহামারীর প্রাদুর্ভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের জন্য এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিজ দেশের প্রশস্ত যমীনে ও তার মুক্ত বাতাসে গমন করাও সমীচীন হবে না।[18]

(৪) ৪৯/৫০ হিজরীর মহামারী : ৪৯ হিজরীতে কূফায় এক ভয়াবহ মহামারী আঘাত হানে। এতে ছাহাবী মুগীরা বিন শু‘বাহ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। কূফায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মুগীরা বিন শু‘বাহ (রাঃ) সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। যখন শুনতে পান যে মহামারী দূর হয়েছে তখন তিনি কূফায় ফিরে আসেন। কিন্তু মহামারী তখনও কিছুটা বিদ্যমান ছিল। ফলে তিনি সে মহামারীতেই আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[19]

(৫) ৫৩ হিজরীর মহামারী : এই মহামারী ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম মহামারী হিসাবে পরিচিত। এতে যিয়াদ বিন আবীহ তথা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান মারা যায়। এই যিয়াদ বিন আবীহ বছরা ও কূফার ক্ষমতা গ্রহণ করে মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেন যে, আমাকে এখন হেজাযের আমীর নিযুক্ত করা হোক। এই চিঠির কথা মদীনাবাসী বিশেষ করে ইবনু ওমর (রাঃ) জানতে পারলে তার বিরুদ্ধে বদদো‘আ করেন। এরপরেই সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।[20]

(৬) মিসরীয় মহামারী : হিজরী ৬৬ সনে মিসরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেন, এই মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মিসরের আমীর আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান পলায়ন করে মরুভূমিতে অবস্থিত হুলওয়ান নামক একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ঐ গ্রামেই মারা যান। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি ৮৫ হিজরীর মহামারীতে হুলওয়ানে মারা যান’।[21]

(৭) জারেফ মহামারী : ৬৯ হিজরীর শাওয়াল মাসে এই মহামারী শুরু হয়। ইতিহাসে এটি ‘ত্বাউনে জারেফ’ নামে পরিচিত। এ সময় মক্কা ও মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)। মুসলিম বিশ্বে তখন উমাইয়া শাসন চলছিল। তবে মক্কা-মদীনা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নিয়ন্ত্রণে। মক্কা-মদীনার শাসনকে কেন্দ্র করে বনু উমাইয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর মধ্যে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে, তখন বছরায় দেখা দেয় ইতিহাসের এই ভয়াবহতম মহামারী। ‘জারেফ’ অর্থ হ’ল ‘সর্বসংহারী’। অন্য অর্থে ‘জারেফ’ মানে নিক্ষেপকারী। বানের পানি যেভাবে সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তদ্রূপ এই মহামারীও সব মানুষকে নিয়ে গিয়েছিল।[22] যাতে মাত্র চারদিনে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ মারা যায়। স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মহামারীতে মারা যায় বলে এর নাম হয় ‘জারেফ’।[23]

এই মহামারীতে আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর তিরিশজন সন্তান ও আব্দুর রহমান বিন আবুবকরের চল্লিশজন সন্তান মারা যায় (নববী, শারহ মুসলিম ১/১০৬)। এতে আরো মারা যায়, ইয়াকুব বিন বুজায়ের, কায়েস বিন সাকান, আহনাফ বিন কায়েস, মালেক বিন ইখামের, হাম্পান বিন ফায়েদ, মালেক বিন আমের ও হুরাইছ বিন কাবীছাহ,[24] প্রসিদ্ধ নাহশাঙ্গবিদ ইমাম আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী (রহঃ)[25] প্রমুখ বিদ্বান মারা যান।[26]

ইবনু আবীদুনিয়া বলেন, মৃতের হার এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, লাশ দাফন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন হিংস্র প্রাণীগুলো এসে লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তাদের থেকে লাশ হেফাযত করতে বাড়ির ভিতরে সবার লাশ রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল।[27]

(৮) আশরাফ মহামারী : হিজরী ৮৬ সনে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই মহামারীতে বহু সম্মানিত মানুষ মারা যান বলে একে ‘ত্বাউনে আশরাফ’ বলে। এই মহামারী বা এর কিছুদিন পরে খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মারা যান। এছাড়াও এতে উমাইয়া বিন খালেদ, আলী বিন আছমা‘ ও ছা‘ছা বিন হেসানসহ বহু লোক মারা যায়। মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তৎকালীন সময়ে একটি প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছিল যে, لا يكون الطاعون والحجاج في بلد واحد ‘মহামারী ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক স্থানে থাকতে পারে না’। কারণ বহু মানুষ হত্যাকারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সে সময় ভিন্ন শহর ওয়াসেত্বে অবস্থান করছিলেন।[28]

(৯) ফাতায়াত মহামারী : ৮৭ হিজরী মোতাবেক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ফাতায়াত মহামারী। যাকে কোন কোন ঐতিহাসিক ‘আশরাফ মহামারী’ নামেও অভিহিত করেছেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এটি শাম থেকে ইরাকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহামারীতে প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল কুমারী ও যুবতী নারীরা এবং এতে বহু যুবতী ও কুমারী নারী মারা যায় বলে একে ‘ত্বাউনে ফাতায়াত’ বলা হয়।[29] আবুল বাহার বাকরাভী তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ‘আমরা ফাতায়াত মহামারী থেকে পলায়ন করে সিনাম ((سنام)) নামক স্থানের পাশে অবস্থান নিলাম। এরই মধ্যে জনৈক আরব ব্যক্তি দশ সন্তানসহ আগমন করল। আমাদের থেকে একটু দূরে তারা অবস্থান নিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার দশ সন্তানই মারা গেল। তাকে দেখেছি সে কবরের পাশে বসে বসে শোক গাঁথা পাঠ করছিল।[30] আইয়ুব বিন সুলায়মান বিন আব্দুল মালেক স্বপরিবারে একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। উক্ত মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সবাই মারা যান।[31] এই মহামারীতে মারা যান প্রসিদ্ধ তাবঈ ও হাদীছ বর্ণনাকারী উমাইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন মুতারিফ বিন শিখীর।[32]

(১০) আদী বিন আরত্বাতের মহামারী : ১০০ হিজরী সনে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। তৎকালীন বছরার গভর্নর আদী বিন আরত্বাতের নামে এর নামকরণ করা হয়। তিনি ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আযীয কর্তৃক নিযুক্ত বছরার গভর্নর।[33] এই মহামারী খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে হয়েছিল। আদির পিতা আরত্বাত বলেন, ‘লোকেরা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে অনুরোধ জানাচ্ছিল যে, তাঁর জন্য যেন খাদ্য-সামগ্রী মজুদ রাখা হয় এবং তার জন্য একজন দেহরক্ষী নিয়োগ করা হয়, যে ছালাতে পাহারা দিবে ও তাকে বহিরাক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিবে। তারা আরো দাবী জানায় যে, তিনি যেন মহামারী থেকে রক্ষা পেতে একাকী অবস্থান করেন যেমনটি পূর্ববর্তী খলীফাগণ করতেন। তখন তিনি বললেন, এখন তাঁরা (খলীফারা) কোথায়? তবুও তারা পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি যদি জান আমি ক্রিয়ামত দিবস ব্যতীত অন্য কোন দিবসকে ভয় করি, তাহলে তুমি আমার ভয়কে বিশ্বাস কর না’।[34]

(১১) ১০৭ হিজরীর মহামারী : হাফেয ইবনু কাছীর ও হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, ১০৭ হিজরীতে শামে ভয়াবহ মহামারী দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারা

কোন ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ করেননি। ইবনু কাছীর বলেন, شَدِيدٌ طَاعُونٌ بِالشَّامِ وَقَعَ فِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَفَعَّ بِالشَّامِ طَاعُونٌ شَدِيدٌ, 'আর এই সালে শামে ভয়াবহ প্লেগ মহারামীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।[35]

(১২) ১১৫ হিজরীর মহামারী : ১১৫ হিজরীতে শামে আবারো মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَفِيهَا وَقَعَ طَاعُونٌ بِالشَّامِ, 'এই সালে শামে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে।[36] এটি শামের প্রথম মহামারী নামেও পরিচিত। এটি ১১৪ হিজরী সনে ছড়িয়েছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন।

(১৩) ওয়াসেত্ব মহামারী : ১১৬ হিজরী সনে ইরাকের 'ওয়াসেত্ব' নামক স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। যা শাম, ইরাক বিশেষ করে ওয়াসেত্ব শহরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। ইবনু কাছীর বলেন, وَفِيهَا وَقَعَ طَاعُونٌ عَظِيمٌ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ, وَكَانَ مُعْظَمُ ذَلِكَ فِي وَاسِطٍ, 'আর এই সনে শাম ও ইরাকে ভয়াবহ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর এটি ওয়াসেত্বে আরো ভয়াবহ ছিল।[37] এজন্য এটি ইতিহাসে 'ত্বাউনে ওয়াসেত্ব' নামে পরিচিত। এই মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

(১৪) গুরাব মহামারী : ১২৭ হিজরীতে গুরাব মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। গুরাব ছিল সে সময়ের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির নাম। এই মহামারীতে সবার আগে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। তাই তার নামে এই মহামারীর নামকরণ করা হয়। উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আব্দুল মালেকের সময় এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে।[38] وَكَانَ طَاعُونٌ خَفِيفٌ يُقَالُ لَهُ طَاعُونٌ غُرَابٌ, وَكَانَ خَفِيفًا, فِي سَنَةِ سَنَعٍ, 'আর ত্বাউনে গুরাব ছিল তুলনামূলক কম ধ্বংসাত্মক। এটি হালকা প্রকৃতির ছিল যা ১২৭ হিজরীতে ছড়িয়ে পড়েছিল'।

(১৫) ১৩১ হিজরীর মহামারী : ১৩১ হিজরীতে ত্বাউনু মুসলিম বিন কুতাইবার প্রাদুর্ভাব ঘটে। উমাইয়া শাসনামলের সর্বশেষ মহামারী ছিল ১৩১ হিজরীর 'ত্বাউনু মুসলিম বিন কুতাইবা'। এ মহামারীতে সবার আগে মৃত্যুবরণ করেন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি মুসলিম ইবনু কুতাইবা। তাঁর নামেই এই মহামারীর নামকরণ করা হয়। বছরায় আপতিত হওয়া এই মহামারীর স্থায়িত্ব ছিল তিন মাস। এটি শাওয়াল মাসে শুরু হয়ে রামাযান মাসে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তখন একইদিনে এক হাজারের অধিক লোকের জানাযা পড়া হ'ত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আইয়ুব সাখতিয়ানীও এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন।[39]

শিক্ষা

১. মহামারী আল্লাহর গযব। সেজন্য তা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে।
২. মহামারী মানুষের আমল সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। তাই নিজেদের আমল সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।[40]
৩. মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত সতর্ক থাকতে হবে। যেমন ছাহাবী ওমর (রাঃ), আবু মূসা আশআরী (রাঃ) সহ অন্যান্যরা সচেতন ছিলেন। বর্তমানে মাস্ক, প্রতিরক্ষামূলক পোষাক পরিধান, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই কিংবা এসকল পদক্ষেপ আল্লাহর প্রতি ভরসারও বিপরীত নয়।
৪. মহামারীতে আক্রান্ত হ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ বিপদে ধৈর্যধারণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও এতে তারা ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। ধৈর্যশীল মুমিন মহামারীতে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।
৫. মহামারীতে আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করা যাবে না এবং মহামারী আক্রান্ত এলাকায় গমন করা যাবে না।
৬. মহামারীর সময় আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার রবের প্রতি বিনয়ী হয়ে ও আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াও।[41]
৭. মহামারীর কারণে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লে রাষ্ট্র ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনভাবে খলীফা ওমর (রাঃ) করতে চেয়েছিলেন। মহামারী পরবর্তী অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য প্রতিটি কৃষি জমি চাষের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনভাবে ওমর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন।
৮. সর্বোপরি দাস্তিকতা ও অহংকারপূর্ণ কথা ও কাজ পরিহার করে আল্লাহর নিকটে তওবা করতে হবে।

উপসংহার

যুগে যুগে মহামারীর আগমন ঘটেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মানুষ ও প্রাণী। বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ফলে শাসকেরা অনেক সময় শহুরে জীবন পরিত্যাগ করে মরুভূমির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এতেও শেষ রক্ষা হয়নি।[42] বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণযুগেও করোনা মহামারী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমল সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা ও তওবা করে মহান স্রষ্টার পানে ফিরে আসার বিকল্প কিছু নেই। কারণ আজ সারা বিশ্বের সকল পরাশক্তি একটি অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে অসহায়। সভ্যতাগর্বীদের সকল অহংকার ও দাস্তিকতা আজ ধূলায় মিশে গেছে। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার যেন আজ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে হার মেনেছে সকলে। অতএব আর অহংকার নয়। দুর্বলের উপর সবলের যুলুম-নির্যাতন নয়। শোষণ-বঞ্চনা নয়। আত্ম সংশোধনের এটিই উপযুক্ত সময়।[43] আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজেদের আমল সংশোধন ও তওবা-ইস্তিগফার করার তাওফীক দান করুন-আমীন।

তথ্যসূত্র

- [1]. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৯০-৯৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৪; ফাৎহুল বারী ৭/৯৯; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩৯৯।
- [2]. ছহীহত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯।
- [3]. মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩১; ছহীহত তারগীব হা/১৪০৩, সনদ ছহীহ।
- [4]. মুসনাদে আহমদ হা/১৫৬৪৬; ছহীহত তারগীব হা/১৪০৫।
- [5]. বাক্বারাহ ২/৫৯; তাফসীরে তাবারী হা/১০৪০, ২/১১৭।
- [6]. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; মিশকাত হা/১৫৪৮।
- [7]. মোল্লা আলী কারী, মিরকাত ৩/১১৩৩, হা/১৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
- [8]. বুখারী হা/১৯৮৯; মুসলিম হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২৭৩৬।
- [9]. তারীখে দিমাশক ৫৮/৩৩৬।
- [10]. নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬।
- [11]. বুখারী হা/৫৭২৯; মুসলিম হা/২২১৯; নববী, শরহ মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
- [12]. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৯০-৯৬; তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৪; ফাৎহুল বারী ৭/৯৯; ইবনু সা'দ ৭/৩৯৯।
- [13]. ইবনু হায়ম, জামহারাতি আনসাবিল আরব ১/১৪৮; আবুল হাসান সামহুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা ২/২৪৪।
- [14]. মুসলিম হা/২০৬৯; ছহীহত তারগীব হা/২২০৩।
- [15]. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৬২, সনদ ছহীহ।
- [16]. কিতাবুল ইবানাহ হা/১৮১৭, ২/২২৬; ইবনুল ক্বাইয়িম, শেফাউল আলীল ১/২১।
- [17]. হাফেয ইবনু হাজার, বায়লুল মাউন ফী ফায়লিত ত্বাউন ৩৬২ পৃ:।
- [18]. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখে তাবারী ২/৪৮৭; তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক ২/৩৩৯; আল-বিদায়াহ ৭/৭৮, ৭/৯০।
- [19]. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক ৩/১৮৫; আল-বিদায়াহ ৮/৩৭; আন-নুজুমুয যাহেরাহ ১/৫৭; আল-কামেল ফিত তারীখ ২/১২৬; মাসূদী, মুরুজুয যাহাব ১/৩৫৮।
- [20]. আন-নুজুমুয যাহেরাহ ১/৫৭; তারীখুল ইসলাম ৪/২১০; সিয়রু আলামিন নুবাল ৩/৪৯৬।
- [21]. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযেরা ফী আখবারে মিসর ওয়াল কাহেরাহ ১/৩০৫; বায়লুল মাউন ফী ফায়লিত ত্বাউন ১/৩৬২।
- [22]. ফাৎহুল বারী ১/৯৭; শরহ মুসলিম ১/১০৫।

- [23]. শরহ মুসলিম ১/১০৬; সিয়রু আ'লামিন নুবালা ৬/১৮।
- [24]. তারীখুল ইসলাম ৫/৬৭।
- [25]. ওয়াফিয়াতুল আইওয়ান ২/৫৩৯।
- [26]. আন-নুজুমুয যাহেরাহ ১/৭২।
- [27]. আল-ইতিবার হা/৩৩, ১/৫৮; বাদায়েঈয যুহর ১/৫২৯।
- [28]. ইবনু কুতায়বাহ, আল-মা'আরেফ ১/১৩৫; আন-নুজুমুয যাহেরাহ ১/৯; নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬; আল-আযকার ১/১৫৪।
- [29]. বাযলুল মাউন ফী ফায়লিত তাউন ১/৩৬৩।
- [30]. ইবনু আবদুন্নিসা. আল-ইতিবার হা/৩৭, ১/৬০।
- [31]. আল-ইতিবার হা/২৩, ১/৪৪।
- [32]. ইবনু হিববান, মাশাহিরু ওলামাইল আমছার ৯১ পৃ: আছ ছিক্বাহ ৪/৪০,৫/৬; আন-নুজুমুয যাহেরাহ ১/২১৪।
- [33]. তারীখে দিমাশক ৪০/৬০।
- [34]. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৫/৩৯৮; তারীখে দিমাশক ৪৫/২৪৯; সিয়রু আ'লামিন নুবালা ৫/১৩৯; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২৯২; তারীখুল ইসলাম ৭/২০২; তারীখুল খোলাফা ১/২০১।
- [35]. আল-বিদায়াহ ৯/২৪৪; বাযলুল মাউন ফি ফায়লিত তাউন ১/৩৬৩।
- [36]. আল বিদায়াহ ৯/৩০৯; বাযলুল মাউন ফি ফায়লিত তাউন ১/৩৬৩।
- [37]. আল-বিদায়াহ ৯/৩১২।
- [38]. ইবনু কুতায়বা, আল-মা'আরেফ ১/১৩৫।
- [39]. শরহ মুসলিম ১/১০৬; আল-মা'আরেফ ১/১৩৫; বাযলুল মাউন ফি ফায়লিত তাউন ১/৩৬৩।
- [40]. ছহীহত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯।
- [41]. শারহ মা'আনিল আছার হা/৬৫৬৪; ছহীহাহ হা/২৮৭৭।
- [42]. বাযলুল মাউন ফি ফায়লিত তাউন ১/৩৬৪।
- [43]. ছহীহত তারগীব হা/২৫৩৩।